পরিত্যক্ত জলাশয়ে জিওল ও মাগুর মাছ চাষ

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পুষ্টি চাহিদা পুরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হচ্ছে। তাই বর্তমানে দেশের প্রতিটি জলাশয় কাজে লাগিয়ে মাছ উৎপাদন করা অতীব জরুরী বিশেষ করে যখন প্রাকৃতিক মৎস্য বিলুপ্ত হয়ে আসছে তখন দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত এবং আগাছাপূর্ণ জলাশয়গুলো পরিচর্যা করে প্রাকৃতিক মৎস্য জিওল ও মাগুর উৎপাদন করে এদের রক্ষা করা সম্ভব।
দেশের মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৫২.৮২ লক্ষ হেক্টর। এই জলাশয়ের মধ্যে মৌসুমী জলাশয়, পথপার্শ্বস্থ ডোবা, জলাধার, বরোপিট ও পাহাড়ী ক্রীক রয়েছে ৫.৭ লক্ষ হেক্টর। এই পরিমাণ জলাশয়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করে জিওল ও মাগুরসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক মৎস্য সংরক্ষণ, উৎপাদন এবং প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি মেটানো সম্ভব। কেননা আমাদের প্রাণীজ আমিষের শতকরা ৬৩% আসে মৎস্য থেকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মাছের মধ্যে জিওল-মাগুরের মধ্যে প্রাণীজ আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি।
যে সকল মৌসুমী পুকুর, থপার্শ্বস্থ ডোবা, জলাধার ও বরোপিট সংস্কার করা হয়ে উঠে না এবং যে জলাশয়গুলোর তলদেশে প্রচুর কাদা থাকে অর্থাৎ অর্থাভাবে এ জাতীয় জলাশয়গুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, সেগুলো ফেলে না রেখে কৈ, জিওল ও মাগুর মাছ চাষ করলে অল্প সময়ে যথেষ্ট ফলন হয় এবং তা বিক্রি করে আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হওয়া যায়। মাত্র ৩-৪ ফুট গভীর জলাশয়ে ৫-৮ মাস এ জাতীয় মাছ চাষ করে বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হয়।

ছবি: মাগুর মাছ

চাষের বৈশিষ্ট্যঃ

* জলাশয় পরিত্যক্ত থাকলে সেখানে নানা প্রকার জলজ আগাছা জন্মায়। পচন প্রক্রিয়ার কারণে এসকল জলাশয়ে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকে না। কিন্তু জিওল ও মাগুর মাছের অতিরিক্ত শ্বসনাঙ্গ থাকার জন্য পানি ছাড়াও এরা বাতাস হতে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে।
* পরিত্যক্ত জলাশয়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায়।
* জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হলেও ভেজা মাটির ছোট ছোট গর্তে জিওল ও মাগুর মাছ আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকে।
* জলাশয় থেকে জিওল-মাগুর মাছ আহরণ করার পরও দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকে। যে জন্য জীবন্ত অবস্থায় তা বাজারজাত করা যায় এবং ক্রেতারা তা কয়েক দিন পানির মধ্যে জীবিত রেখে টাটকা অবস্থায় খেতে পারেন।
* এসব মাছে প্রাণীজ আমিষের পরিমাণ বেশী থাকায় ভোক্তারা প্রয়োজনীয় আমিষ পেতে সক্ষম হন।
* পোনা-প্রাপ্তি সহজ হয়।
* চাষ ব্যবস্থাপনায় খরচ কম।

* পরিত্যক্ত মৌসুমী পুকুর, বরোপিট, পথিপার্শ্বস্থ ডোবা ও জলাধারে এ মাছ চাষ করা সহজ।

পোনা-প্রাপ্তি ও অবমুক্তিঃ
সরকারীভাবে জিওল ও মাগুর মাছের পোনা উৎপাদন বা বিক্রির তেমন ব্যবস্থা নেই। বর্ষা মৌসুমে সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রজাতির জিওল ও মাগুর মাছ ডোবা, নালা, হাওড়-বাওড় ছাড়াও ধানের ক্ষেতে সঞ্চিত পানিতে ডিম পাড়ে এবং এ সকল জলাশয় থেকে পোনা পাওয়া যায়। তখন এ সকল স্থান হতে বা বাজারে চারা পোনা উঠলে সেখান থেকে সংগ্রহ করা যায়। সাধারণতঃ ৪-৫ সেন্টিমিটার মাপের জিওলের পোনা প্রতি বর্গ মিটার জলাশয়ে ৬০-৮০টি ছাড়া যেতে পারে। ৫-৮ সেন্টিমিটার মাপের মাগুরের পোনা প্রতি বর্গমিটার জলাশয়ে ৫০-৭৫টি ছাড়া যায়।

খাদ্য সরবরাহঃ
জলাশয়ের তলদেশের কাদা-পাঁক জিওল ও মাগুর মাছের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না। অধিকন্তু ঐ কাদায় যে কেঁচো, শামুক এবং কীট-পতঙ্গের বাচ্চা থাকে তা জিওল-মাগুর মাছ প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি পোনার মোট ওজনের শতকরা ৩-৫% হারে পরিপূরক খাদ্য প্রতিদিন প্রদান করলে মাছের উৎপাদন বাড়ে। তাই, হিসেব অনুযায়ী মোট পরিপূরক খাদ্যের মধ্যে কুঁড়া ৪০% সরিষার খৈল ২০% শুটকি বা শামুকের চূর্ণ ১০% হাঁস-মুরগির নাড়ি-ভুঁড়ি ২০% এবং হাড়ের চূর্ণ বা পশুর রক্ত ১০% একত্রে মিশিয়ে সামান্য পানি দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরী করে জলাশয়ের ৪-৫টি স্থানে (জলার পাড়ের অনতিদূরে) পানির মধ্যে নিক্ষেপ করে অথবা ট্রে-তে করে দেড় ফুট পানির নীচে ডুবিয়ে খাদ্য প্রদান করা যায়।

উপসংহারঃ
দেশে ক্রমাগতভাবে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে অথচ সে অনুপাতে আমিষের উৎপাদন হচ্ছে না। তাই স্বল্প পরিসরে এ দেশের প্রতিটি জলাশয়কে মাছ চাষের উপযোগী করে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে। এর ফলে পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহে জিওল ও মাগুর মাছের উৎপাদন অব্যাহত থাকবে। এতে আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে চাষিরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। এ ব্যবস্থার ফলে লুপ্ত-প্রায় প্রাকৃতিক মৎস্য সংরক্ষণ, আর্থিক লাভ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

পুকুরে শিং-মাগুর চাষ

মাছপ্রিয় মানুষমাত্রই জিওল মাছের ভক্ত। জিওল মাছের চাহিদা অন্যান্য মাছের চেয়ে বেশি। দামও বেশি। কিন্তু বর্তমানে দেশে জিওল মাছের আকাল চলছে। ক্রমে বিদেশি মাছের বা নতুন নতুন আমদানিকৃত প্রজাতির ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে সব জিওল মাছ। জিওল মাছের মধ্যে শিং-মাগুর অন্যতম। তবে আশার কথা, এসব মূল্যবান শিং-মাগুর চাষ করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব এবং তা ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনতে পারে।

পুকুর প্রস্তুতি ২০ থেকে ৩০ শতাংশের পুকুরে শিং-মাগুর চাষ অধিক উপযোগী। প্রথমে পুকুরের পানি সেচ দিয়ে শুকিয়ে পুকুরের তলদেশে রোদ লাগাতে পারলে ভালো হয়। এ সময় পাড় মেরামত এবং ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা আবশ্যক। তবে নতুন কাটা পুকুরের ক্ষেত্রে নিজেদের মনের মতো করে পুকুর প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু পানিপূর্ণ পুকুর হলে প্রথমে রোটেনন/টিসিড কেক প্রয়োগে রাক্ষসী মাছ অপসারণ করতে হবে।
প্রতি শতাংশে প্রথমে এক কেজি চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুর প্রস্তুতির মূল কাজ শুরু করতে হয়। তবে চুন ছাড়াও জিওলাইট (প্রতি শতকে ১-২ কেজি) পুকুর প্রস্তুতির সময় প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এরপর প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি গোবর, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করা আবশ্যক। এর ৫-৬ দিন পর পুকুরে ২-৩ ইঞ্চি সাইজের শিং-মাগুর পোনা ছাড়া হয়।

কত পোনা ছাড়তে হবে? শিং এবং মাগুর একক বা মিশ্র চাষ করা যায়। একক চাষে মাগুর প্রতি শতাংশে ২৫০ এবং শিং ৪০০টি দেওয়া যায়। তবে মিশ্র চাষে মাগুর ১৫০ এবং শিং ২০০টি (প্রতি শতাংশে) ছাড়তে হবে। অবশ্যই ছাড়ার সময় পোনা ২ -৩ ইঞ্চি হওয়া আবশ্যক।

খাবার শিং-মাগুর প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার পছন্দ করে। যদিও পুকুরের তলদেশের জলজ কীট এবং বর্জ্যও খেয়ে থাকে, তথাপি লাভজনক চাষে মানসম্মত খাবার প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রথমদিকে ৩৫ শতাংশ প্রোটিন এবং শেষদিকে ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ প্রোটিনযুক্ত খাবার প্রয়োগ করা উচিত। শিং-মাগুরের জন্য কারখানায় প্রস্তুত রেডি ফিড অধিক কার্যকর। মানসম্মত পোনা, মানসম্মত প্রয়োজনীয় সুষম খাবার ও আদর্শ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে ৬-৭ মাসে প্রতিটি শিং ৬০ থেকে ৭০ গ্রাম এবং মাগুর ১০০ থেকে ১২০ গ্রাম হয়ে থেকে।

চাষের আদর্শ সময় এপ্রিল-মে মাস থেকে এ মাছ চাষ শুরু করা যায়। যারা শিং-মাগুর চাষে আগ্রহী তাঁরা জুন-জুলাই মাসেও চাষ শুরু করতে পারেন।

চাষ পরিচর্যা * শিং-মাগুর চাষে বেশি পানির দরকার হয় না। পোনা নার্সিংয়ের সময় দুই ফুট পানিই যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে ৩-৩.৫ ফুট পানিতেই চাষ হয়।
* পোনা ছাড়ার পর নিয়মিত পরিমিত খাবার দিতে হবে। প্রয়োজনীয় খাবার দিনে ২-৩ বারে ভাগ করে দেওয়া আবশ্যক।
* পুকুরের পানির গুণাগুণের সঙ্গেও মাছের বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে পানির গুণাগুণ রক্ষা করা আবশ্যক। প্রতি মাসে একবার 'জিওলাইট' এবং একবার 'প্রোবায়োটিকস' প্রয়োগে চাষের ফল ভালো হয়।

* রোগাক্রান্ত পোনা মজুদ করলে প্রত্যাশিত ফল আসবে না। এ ছাড়াও মাঝেমধ্যে মাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
* কখনো পোনার ত্বকের ওপর সাদা তুলার মতো দাগ দেখা যেতে পারে। সেপ্রোলেগনিয়া নামক ছত্রাকের জন্য এমনটি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ম্যালাকাইট গ্রিন/ফরমালিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়।
* প্রোটোজোয়া বা অন্যান্য পরজীবী কর্তৃক মাছ রোগাক্রান্ত হতে পারে। এ অবস্থায় ফরমালিন এবং ম্যালাকাইট গ্রিন ছাড়াও কৃমিজাতীয় পরজীবী নিয়ন্ত্রণে ডিপটারেক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।
* অধিক খাবার প্রয়োগ বা জৈব পদার্থের পচনের মাধ্যমে পানিতে অ্যামোনিয়ার মাত্রা বাড়তে পারে। এ অবস্থায় মাছের বৃদ্ধি স্থবির হয়ে যায়। এ সমস্যা দূর করতে পানি পরিবর্তন করা যেতে পারে। তা ছাড়া পানিতে বায়ো একোয়া প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।
* অপুষ্টিজনিত কারণে মাছের মাথা বড়, শরীর সরু হয়ে যায়। কখনো মাছের মাথায় ফাটা দেখা যায়। এ অবস্থায় পুষ্টিসম্পন্ন খাবার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।
* শিং-মাগুর চাষে নানা সমস্যায় পরামর্শের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

দেশি মাগুরের চাষ

মাগুর বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় মাছের মধ্যে অন্যতম। সুস্বাদু ও উপাদেয় এ মাছ দেশের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। এছাড়া রোগীর পথ্য তথা পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবেও মাগুরের চাহিদা সর্বজনবিদিত।

দেশি মাগুরের বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত শ্বাসনালী থাকায় পানি ছাড়াও বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। তাই মজা ও পচা পুকুর, ছোট ছোট ডোবা ইত্যাদি জলাশয়ের দূষিত পানিতেও মাগুর মাছের বেঁচে থাকতেও কোনো সমস্যা হয় না। পুকুরের পানি শুকিয়ে গেলে যে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সে অবস্থায়ও ছোট ছোট গর্ত করে এ মাছ দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। পানি থেকে উত্তোলনের পর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কারণে জীবন্ত মাগুর মাছ বাজারজাত করা সম্ভব।

দেশি মাগুরের চাষ পদ্ধতি

পুকুর নির্মাণ : পুকুরের আয়তন ১০ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশ এবং গভীরতা ৮০ থেকে ১২০ সেন্টিমিটার (৩ ইঞ্চি থেকে ৪ ফুট) হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিক গভীরতা উৎপাদনের দিক থেকে অসুবিধাজনক। কেননা, মাগুর মাছকে শ্বাস নেয়ার জন্য সব সময় উপরে আসতে হয়। এতে অতিরিক্ত শক্তিক্ষয়ের কারণে মাছের বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে।

পুকুর তৈরি : পাড়ের ঊর্ধ্বসীমা অবশ্যই সর্বোচ্চ বন্যার লেভেল থেকে ৩০ সেন্টিমিটার (১ ফুট) উপরে রাখা আবশ্যক। এতে বৃষ্টির সময় মাছ বুকে হেঁটে বাইরে যেতে পারে না। তদুপরি বাইরে থেকে সাপ-ব্যাঙ ইত্যাদি মৎস্যভুক প্রাণীও পুকুরে প্রবেশের কোনো সুযোগ পাবে না। এছাড়া পুকুরের চারদিকের পাড়ের ওপর ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু নেটের বেড়া দেয়া বাঞ্ছনীয়।

চুন প্রয়োগ : পুকুরের তলদেশ শুকিয়ে হাল্কাভাবে চাষ দিয়ে তলার মাটির পিএইচ পরীক্ষা সাপেক্ষে প্রতি শতাংশে ১ থেকে ১.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের পর পুকুরে ১৫ সেন্টিমিটার (৬ ইঞ্চি) পরিমাণ পানি ঢুকিয়ে সপ্তাহ খানিক ধরে রাখা আবশ্যক।

সার প্রয়োগ জৈব সার প্রয়োগের সাতদিন পর পানির উচ্চতা ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বজায় থাকা অবস্থায় প্রতি শতাংশ ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০ গ্রাম এমপিও সার ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, পানির রঙ বাদামি সবুজ লালচে বাদামি হাল্কা সবুজ লালচে সবুজ অথবা সবুজ থাকাকালীন অজৈব সার (রাসায়নিক) প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই।

পোনা মজুদ : পুকুরে ৫ থেকে ৮ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যরে সুস্থ-সবল পোনা প্রতি বর্গমিটারে ৫০ থেকে ৮০টি ছাড়া যেতে পারে। মে থেকে জুন মাসে মাগুরের পোনা ছাড়ার যথার্থ সময়।

মাগুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা : প্রাকৃতিক পরিবেশে মাগুর মূলত জলাশয়ের তলদেশের খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করে। প্রাকৃতিক এই খাদ্যগুলো হচ্ছে জলাশয়ের তলায় আমিষ জাতীয় পচনশীল দ্রব্যাদি। প্রাণী প্লাঙ্কটন ও কেঁচো জাতীয় ক্ষুদ্রাকার প্রাণী ইত্যাদি।

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ : অধিক ঘনত্বে চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ অপরিহার্য। সহজলভ্য দেশীয় উপকরণ সমন্বয়ে মাগুর মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। এ ক্ষেত্রে চালের কুড়া ৪০ শতাংশ, তৈলবীজের খৈল ৩০ শতাংশ ও শুঁটকি ৩০ শতাংশ একত্রে মিশিয়ে গোলাকার বল তেরি করে মাছকে সরবরাহ করা যেতে পারে। তাছাড়া শামুক ও ঝিনুকের মাংস মাগুরের অত্যন্ত প্রিয় খাবার। এগুলোও অবাধে খাওয়ানো যায়।

খাদ্যের প্রয়োগমাত্রা : পুকুরে মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের ৫ থেকে ১০ শতাংশ হারে দৈনিক খাদ্যের এক-চতুর্থাংশ সকালে এবং বাকি তিন-চতুর্থাংশ সন্ধ্যায় প্রয়োগ করতে হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, উপরোক্ত প্রযুক্তি মোতাবেক পুকুরে চাষকৃত দেশি মাগুরের ওজন অনধিক চার থেকে ৫ মাসে ১৭৫ থেকে ২০০ গ্রামে উন্নীত করা সম্ভব।